

সেচেন স্বাধীনতা

রুশ-সেচেন যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা

আফ্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০৫

চেচেন বীরঙ্গনা

রুশ-চেচেন যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা

মূল

পল জে. মারফি

অনুবাদ

আজমিন আক্তার ইভা

সম্পাদনা

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইত্তিফাদ

বু ক স



সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	১৩
অনুবাদের কথা	১৫
চেচনিয়ার ইতিহাসের এক ঝলক	১৭
লেখকের ভূমিকা	২৩
সূচনা	২৯

১ম অধ্যায়

মাতৃ অগ্নি: ঐতিহ্যবাহী চেচেন নারী	৩৬
রাঁধুনি, গৃহপরিচারিকা, শান্তির রক্ষক	৩৭
ভালোবাসার বিয়ে	৪২
সে হবে আমার বউ!	৪৬
পরিবারের সম্মান রক্ষা	৫১
ভিনদেশিকে বিয়ে	৫৪
ফাতিমা ও সের্গেই	৫৬
গুলিয়া ও সাশা	৫৭
লায়লা ও স্তাস	৫৯
জারিনা ও সের্গেই	৬০
তালক একটি পাপ	৬২

২য় অধ্যায়

নরকে স্বাগতম!	৬৪
বোমা, বোমা, এবং আরও বোমা	৬৫

৮ ♦ চেচেন বীরাজনা

ভুল টার্গেট	৬৬
নরকের গহ্বরে	৭০
প্রথম যুদ্ধটাই যেন ভালো ছিল	৭৪
ভুল হামলার শিকার	৮৪
নারকীয় জাখিস্তকা	৮৭
আলখান-ইউর্ত -১৯৯৬ এবং ১৯৯৯	৯৮
খেদা কুঙ্গায়েভার ধর্ষণ ও হত্যা	১০০
স্তারোপ্রোমিসলোভস্কি-১৯৯৯	১০১
নোভিয়ে আলদি-২০০০	১০৩
দুবা-ইউর্ত	১০৭
দুই সার্জেন্টের বিচার	১০৭
গুলি-বাড়ের মধ্যে	১১০

৩য় অধ্যায়

অনিঃশেষ যন্ত্রণা	১১৬
কোনো চিহ্ন ছাড়াই নিখোঁজ	১১৭
অপহরণের পেছনে কারা	১২৩
অপহরণের শিকার নারীরা	১২৯
নাতাশা ও ২০০৯ সালের বিপন্ন নারীরা	১৩১
নারীদের জন্য বিশেষায়িত টর্চার সেল	১৩৭
কাফির ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা	১৪২
জিহাদের আঘাত	১৪৯

৪র্থ অধ্যায়

অস্ত্র হাতে চেচেন নারী	১৬২
হাড়ি বাজিয়ে গান গাওয়া যোদ্ধা মেয়েরা	১৬৪
দ্য শুটারস	১৬৬
বুদেনোভস্কের নার্স ও স্কুলছাত্রী	১৭১

রাদুয়েভের নারী যোদ্ধা	১৭৪
আসিয়া ও আনিয়ার গল্প	১৮০
স্নাইপার আনিয়া	১৮২
লারিসা—প্রথম ও দ্বিতীয়	১৮৬
গোজনির পরিচ্ছন্নতাকর্মী নারীরা	১৮৮
বারলান্ত আবুকরোভা ও লিপা বিলুয়েভা	১৮৮
শহীদ ব্রিগেড-এর নারীরা	১৮৯
আইনা ইউনুসোভা ও রাইসা জাকিয়েভা	১৯০
মালিকাত দাদাশেভা ও জামা মানসুয়েভা	১৯১
মালকান চাগায়েভা	১৯১
নামহীনারা	১৯২
নারী সহযোগীরা	১৯৩
পাহাড়ি বিচার	১৯৪
বার্তাবাহক ও জাল টাকার কারবারিরা	১৯৯
বহুমুখী গোয়েন্দা তৎপরতা	২০১
উষ্ণ বিছানা আর গরম খাবার	২০২

৫ম অধ্যায়

বোনদের জোট	২০৬
ওরা তেরোজন	২০৮
জান্নাতের মূল্য	২১১
আত্মঘাতী তরুণীরা	২১৪
দুরোভকা থিয়াটারে হামলাকারী বোনেরা	২১৮
বিধবারা	২১৯
নববধূ ও বিবাহিতারা	২২৩
স্কুলগার্ল	২২৮
নেতৃত্বে ছিলেন যারা	২৩২
যোদ্ধা, ফার্মাসিস্ট ও দাদী	২৩৫
পরিচয়হীনা	২৩৭

আমরা মরতে প্রস্তুত	২৩৮
কেস ক্লোজড!	২৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃতের পাহাড়	২৪২
শিকারি পুতুল ও আগ্রাসীরা	২৪৪
টার্গেট আহমাদ কাদিরভ	২৪৭
ধৈর্য ও খুন করতে জানে	২৪৯
নারী কামাজ চালক	২৫০
মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় নেই	২৫০
আমি ব্যর্থ হয়েছি	২৫১
তোমার ব্যাগে কী?	২৫৩
আত্মঘাতী বেল্ট	২৫৯
হাসপাতাল	২৬০
নোগাই যোদ্ধার প্রতিশোধ	২৬০
ইয়েসেনতুকি	২৬১
ময়লা জুতা	২৬১
ইর্মাজেসি স্কোয়াড গার্ল	২৬৩
নয় সেকেন্ড	২৬৬
রিজস্কায়া	২৭১
আমরা শিশুদের হত্যা করতে চাই না	২৭৩

সপ্তম অধ্যায়

আত্মঘাতীদের সন্ধান	২৭৮
ব্যর্থ পদক্ষেপ	২৭৯
তালিকা	২৮১
অপারেশন ফাতিমা	২৮৪
ভস্মীভূত ভূমি	২৮৭

বেসলান হামলার পর.....	২৯২
কেন নারীরা আত্মঘাতী হয়?	২৯৬
ব্যক্তিগত প্রতিশোধের উদ্দেশ্য	৩০১
নির্দিষ্ট পরিচয়ের উদ্দেশ্য	৩০৩
শাহিদারা ফিরে এসেছে!.....	৩০৪

৮ম অধ্যায়

ছাই থেকে পুনর্জন্ম	৩১০
ক্ষুধার তাড়না.....	৩১২
পরিবারের ভরণ-পোষণ	৩১৭
বাজারে বিক্রেতা নারীরা.....	৩১৯
উদ্যোক্তা নারীরা.....	৩২১
সমাজসেবায় নারীরা	৩২৩
গোজনির ফেরেশতা.....	৩২৫
অপরাধ জগতের নারীরা.....	৩২৮
নারীদের আর কাঁদতে হবে না	৩৩৩
প্রতিবাদী মায়েরা	৩৩৫
সংগঠকেরা	৩৫০

৯ম অধ্যায়

পম্পেই প্রতিরক্ষা	৩৫৮
নিঃসঙ্গ নারীদের প্রজন্ম.....	৩৫৯
যেভাবে বিলুপ্তি রোধ হলো.....	৩৬৩
আমরা ভেঙে পড়েছি.....	৩৬৪
পম্পেই প্রতিরক্ষা	৩৭০
রেফারেন্স.....	৩৭৭



চেচনিয়ার ইতিহাসের এক ঝলক

—সম্পাদক

চেচনিয়া সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে ককেশাস অঞ্চল সম্পর্কে। ককেশাস অঞ্চল হচ্ছে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী এক বিশাল পর্বতময় এলাকা। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত—১. উত্তর ককেশাস (North Caucasus) – যা রাশিয়ার অধীনে। ২. দক্ষিণ ককেশাস (South Caucasus) – যেখানে আছে স্বাধীন তিনটি দেশ: জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান।

রাশিয়ার অধীনে থাকা উত্তর ককেশাস অঞ্চলের প্রজাতন্ত্রগুলো হলো—চেচনিয়া, দাগেস্তান, ইঙ্গুশেতিয়া, উত্তর ওসেটিয়া, কাবারদিনো-বালকারিয়া, কারাচায়েভো-চেরকেসিয়া, আদিগেয়া।

ককেশাসে ইসলামের আগমন

প্রাচীনকাল থেকেই ককেশাস অঞ্চল ছিল সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের সংযোগস্থল। একদিকে বাইজেন্টাইন খ্রিস্টান প্রভাব, অন্যদিকে পারস্যের জরাথুস্ত্রী ঐতিহ্য, আর উত্তর থেকে আসা তুর্কি-অলতাইক সংস্কৃতি—সব মিলিয়ে এটি ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক মেলবন্ধন।

১. প্রাথমিক সংস্পর্শ (৭ম শতাব্দী)

ইসলাম ককেশাসে আসে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, খলিফা উসমান রা. ও আলী রা. –এর যুগে। তখন আরব মুসলিম বাহিনী পারস্য জয় করে কাস্পিয়ান উপকূল ধরে উত্তরে অগ্রসর হয়।

৬৪২ খ্রিস্টাব্দে আরবরা প্রথমবারের মতো বর্তমান দাগেস্তান অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং দারবন্দ (Derbent) শহরটি দখল করে। দারবন্দ ছিল তখন ককেশাসের

দ্বার — এখানেই ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তর প্রাচীর, যাকে বলা হতো বাবুল আবওয়াব বা ‘দ্বারসমূহের ফটক’। এখান থেকেই ইসলামের প্রচার শুরু হয়।

২. দারবন্দ: ইসলামের প্রাচীনতম কেন্দ্র

দারবন্দ ককেশাসে ইসলামের প্রথম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আরবরা এখানে প্রশাসন, শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠা করে; স্থানীয় লেজগিন, দরগিন, তাবাসারান, আভার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। দারবন্দের বহু প্রাচীন মসজিদ আজও ইসলামের সেই প্রাথমিক ইতিহাসের সাক্ষী।

৩. ধীরে ধীরে বিস্তার (৮ম–১০ম শতাব্দী)

এরপর কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলাম উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে— প্রথমে দাগেস্তান-এর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে, পরে চেচেনিয়া, ইঙ্গুশেতিয়া, কাবারদিনো-বালকারিয়া, ও কারাচায়েভো-চেরকেসিয়া অঞ্চলে। আরব দাঈ ও সুফি শায়খরা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম প্রচার করেন। তাদের প্রভাবেই এখানে ইসলামী শিক্ষা ও তরিকাহভিত্তিক সুফিবাদের বিকাশ ঘটে।

৪. সুফিবাদের প্রভাব (১২শ–১৮শ শতাব্দী)

ইসলামের সবচেয়ে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব আসে সুফি আন্দোলনের মাধ্যমে। বিশেষ করে নকশবন্দি ও কাদিরি তরিকা উত্তর ককেশাসে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এই তরিকাগুলো মানুষকে শুধু ধর্মে নয়, নৈতিকতা, আত্মসংযম ও সামাজিক সংহতিতে ঐক্যবদ্ধ করে। সুফি শায়খরা জনগণের মাঝে ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

এভাবেই উত্তর ককেশাসে ইসলাম গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, কারণ এখানকার সমাজ ছিল বিকেন্দ্রীভূত ও গোত্রভিত্তিক, যেখানে ইসলামি ন্যায়, শূরা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সুফি তরিকার মানবিক ও আধ্যাত্মিক দাওয়াত এই অঞ্চলের জনগণকে ধর্মীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে, এবং পরবর্তীতে রুশ সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের মুখে ইসলামই হয়ে ওঠে তাদের জাতীয় প্রতিরোধের শক্তি ও পরিচয়ের প্রতীক। অন্যদিকে দক্ষিণ ককেশাসে— বিশেষত আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় ইসলাম সেইভাবে ছড়াতে পারেনি। কারণ এই অঞ্চলগুলো

বহু শতাব্দী আগে থেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং শক্তিশালী চার্চ প্রতিষ্ঠান সমাজে গভীর শিকড় গেড়ে বসেছিল। এছাড়া বাইজেটাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তাদের ইসলামি প্রভাব থেকে দূরে রেখেছিল।

দক্ষিণ ককেশাসের আজারবাইজানে ইসলাম অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাবের কারণে সেখানে শিয়া ধারাই প্রাধান্য পায়।

রুশ সাম্রাজ্যের আগ্রাসন ও ইসলামী প্রতিরোধ (১৮শ-১৯শ শতাব্দী)

আঠারো শতকের শেষ দিকে রুশ সাম্রাজ্য দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ককেশাসকে দখলের পরিকল্পনা শুরু করে। ভূগোলগতভাবে এই অঞ্চল ছিল কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝের এক গুরুত্বপূর্ণ করিডর, যা রাশিয়ার সামরিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এই আগ্রাসন ছিল স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ওপর সরাসরি আঘাত।

চেচেনিয়া ও দাগেস্তানের পাহাড়ি জনগণ ইসলামি বিশ্বাস ও গোত্রীয় ঐক্যের শক্তিতে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ ক্রমে রূপ নেয় এক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে, যার নেতৃত্বে উঠে আসেন ইমাম শামিল (১৭৯৭-১৮৭১)—দাগেস্তানের নকশবন্দি সুফি শায়খ ও এক অসাধারণ সংগঠক।

শামিল ‘ইমামত অব দাগেস্তান অ্যান্ড চেচেনিয়া’ নামে একটি ইসলামি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে শরিয়াহ ছিল আইন, সুফিবাদ ছিল নৈতিক ভিত্তি, আর প্রতিরোধ ছিল অস্তিত্ব রক্ষার উপায়। প্রায় পঁচিশ বছর তিনি রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সফল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলা ককেশাসের জনগণের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

১৮৫৯ সালে ইমাম শামিল বন্দি হন, কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পণও ককেশাসে ইসলামী চেতনার অবসান ঘটাতে পারেনি।

সোভিয়েত যুগে উত্তর ককেশাস

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর উত্তর ককেশাস রুশ সাম্রাজ্যের বদলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশে পরিণত হয়। নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধর্মকে ‘প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি’ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইসলামসহ সব ধর্মীয় কার্যক্রমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মসজিদ, মাদ্রাসা ও সুফি খানকাগুলো বন্ধ করে

দেওয়া হয়; বহু আলেম ও শায়খ থেফতার বা নির্বাসিত হন। ফলে পাহাড়ি গ্রাম ও পারিবারিক পরিবেশে ধর্মচর্চা গোপনে চলতে থাকে। সুফি তরিকার শায়খরা নীরবে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা টিকিয়ে রাখেন, যা পরবর্তী প্রজন্মে ইসলামের পুনর্জাগরণের ভিত তৈরি করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু চেচেন ও ইঙ্গুশ জার্মানদের সহযোগিতা করার ফলে স্টালিন প্রশাসন ‘বিশ্বাসঘাতকতার’ অভিযোগে পুরো চেচেন ও ইঙ্গুশ জনগণকে সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ায় নির্বাসিত করে। লক্ষাধিক মানুষ পথেই মারা যায়, আর যারা বেঁচে ছিল তারা দশকের পর দশক নির্বাসনে কাটায়। ১৯৫৭ সালে খ্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে নির্বাসিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর ফিরে আসার অনুমতি দেন। চেচেনরা আবার স্বভূমিতে ফিরে আসে, কিন্তু তখন তাদের ভূমি ও ঘরবাড়ি ছিল অন্যদের দখলে।

এই প্রত্যাবর্তন ইসলামি চেতনার পুনর্জাগরণেরও সূচনা করে—ধর্ম, জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয়ের প্রতি গভীর টান আবার জেগে ওঠে।

সোভিয়েত পরবর্তী উত্তর ককেশাস: চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রথম রুশ-চেচেন যুদ্ধ

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর উত্তর ককেশাস অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। সেই সময় চেচনিয়া, যা সোভিয়েত যুগে চেচেন-ইঙ্গুশ অটোনোমাস রিজিয়ন হিসেবে পরিচিত ছিল, স্বাধীনতা চাওয়া শুরু করে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কিংবদন্তি নেতা জাওহার দুদায়েভ, যিনি সোভিয়েত আমলে একজন বিমানবাহিনীর সদস্য পাইলট ছিলেন। তিনি ছিলেন চেচেন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক।

দুদায়েভ চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং ‘ইচকেরিয়া প্রজাতন্ত্র’ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়। তিনি সাধারণ মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত করেন এবং চেচেনদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বীজ বপন করেন। চেচনিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ তার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়।

কিন্তু রাশিয়া চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, কারণ এখানে আছে প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুদ। এছাড়া কৌশলগতভাবেও এই অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ১৯৯৪ সালে রাশিয়া প্রথমবারের মতো চেচনিয়ার অভ্যন্তরীণ স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেনা অভিযান চালায়। এভাবেই শুরু হয় প্রথম রুশ-চেচেন যুদ্ধ।

চেচেনরা গেরিলা পদ্ধতিতে রাশিয়ার আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা জঙ্গলে, পাহাড়ে লুকিয়ে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক ও হেলিকপ্টার আক্রমণ করে। চেচনিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল গ্রোজনি শহরে রাশিয়ার আক্রমণ। শহরটি প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মারা যায়। তবে চেচেনদের মনোবল ভাঙেনি। দুদায়েভের নেতৃত্বে তারা স্থল ও পাহাড়ে গেরিলা কৌশল ব্যবহার করে রাশিয়ার সামরিক শক্তিকে বারবার চাপে ফেলে। যুদ্ধের বছরগুলো ছিল চেচেনদের জন্য অনেক কষ্টের, কিন্তু একই সঙ্গে তারা স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

১৯৯৬ সালে কয়েক বছরের মারাত্মক সংঘাতের পর রাশিয়ার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষের দিকে অগ্রসর হয়। কায়ান্টিপ শান্তি চুক্তি অনুসারে চেচেনিয়াকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং রাশিয়ার সৈন্যরা শহর থেকে সরে আসে। যদিও স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়নি, চেচেনদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা চেষ্টা এবং দুদায়েভের সাহস বিশ্বজুড়ে নজর কেড়ে নেয়।

ইসলামী বিপ্লবের সূচনা দ্বিতীয় রুশ-চেচেন যুদ্ধ: দুদায়েভ হত্যাকাণ্ড ও কাদিরভের ক্ষমতাগ্রহণ

১৯৯৯ সালে উত্তর ককেশাসে চেচনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। এদিকে সেই বছরের আগস্টে চেচন নেতা শামিল বাসায়েভ সীমান্ত পেরিয়ে দাগেস্তানে প্রবেশ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। শামিল বাসায়েভ ছিলেন চেচনিয়ার অন্যতম প্রতিভাবান ও সাহসী সেনাপতি। তিনি ছোটবেলা থেকেই লড়াইয়ে সক্রিয় ছিলেন এবং চেচন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রথম যুদ্ধে দুদায়েভের সময় তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নেতা ছিলেন। ইমাম শামিলের যুগে যেহেতু চেচনিয়া ও দাগেস্তান একসাথে ইসলামী ইমারাত হিসেবে একক রাষ্ট্র ছিল, শামিল বাসায়েভ সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ইসলামী শাসনের ধারণা প্রচার করেন এবং গ্রাম ও পাহাড়ে সমন্বিত ইসলামী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এর ফলে দাগেস্তানের সরকারের সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এই অজুহাতে রাশিয়া আবার চেচনিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করে।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ থেকে রাশিয়ার সেনারা চেচন সীমান্ত অতিক্রম করে দাগেস্তানে বাসায়েভের বাহিনী এবং ইসলামিক লড়াকুদের দমন করতে। একই

সময়ে চেচনিয়ার অভ্যন্তরীণ স্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাশিয়ার বিমান, ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনীও ঢুকতে শুরু করে। ইতিহাসবিদরা এই সময়টিকেই দ্বিতীয় রুশ-চেচেন যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে গণ্য করেন।

যুদ্ধের শুরু থেকেই এটি কোনো সাধারণ জাতীয়তাবাদী লড়াই ছিল না; চেচেন লড়াকুরা কেবল স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং ইসলামী শাসন ও ধর্মীয় স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছিলেন। জোখার দুদায়েভ চেচনীয়দের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতাবাদী চেতনার প্রতীক হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর শামিল বাসায়েভ কৌশলী সেনাপতি হিসেবে পাহাড় ও জঙ্গলে রাশিয়ার আধুনিক সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য স্থানীয় ইসলামী কমান্ডাররা শহর ও গ্রামে চেচন বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন। এই যুদ্ধে চেচনিয়ার বাইরের মুসলিম বিশ্ব থেকেও বহু জিহাদি নেতা অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে সৌদি আরবের আল খাত্তাবি এবং আমেরিকার আউকাই কলিন্স অন্যতম।

ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে জানুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত গ্রোজনি শহরে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক ও বিমান আক্রমণে প্রায় পুরো শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে পাহাড় ও গ্রামে চেচন বাহিনী ছোট দল নিয়ে রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, সাধারণ মানুষও সংঘাতে জড়ায়। এই সময় আহমদ কাদিরভ, যিনি আগে দুদায়েভের মিত্র ছিলেন, রাশিয়ার সমর্থনে চেচনিয়ায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ন্ত্রণে আনেন, ফলে স্বাধীনতাকামী চেচেনদের জন্য দুই দিক থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। চেচেনদের লড়াই তখন একসাথে দুই শক্তির বিরুদ্ধে—রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় কাদিরভ প্রশাসন।

১৯৯৯ সালে যুদ্ধ চলাকালীন জাওহার দুদায়েভকে রাশিয়ার বিমানবাহিনী হত্যা করে। তার মৃত্যু স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের নেতৃত্বে বিশাল শূন্যতা তৈরি করে এবং চেচেনদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় কাদিরভ পরিবার চেচনিয়ার কার্যত একচ্ছত্র শাসক হিসেবে রাশিয়ার আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে ক্ষমতা ধরে রাখে এবং রুশদের চেয়ে অধিক আগ্রাসী হয়ে বিপ্লবী চেচেনদের দমন করতে শুরু করেন। আহমদ কাদিরভের মৃত্যুর পর তার ছেলে রমজান কাদিরভ ক্ষমতা গ্রহণ করে, রাশিয়ার সাহায্যে তিনি বিপ্লবকে তিনি চূড়ান্তভাবে দমন করতে সমর্থ হন।





লেখকের ভূমিকা

আমি *Allah's Angels* বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করি রাশিয়াতে বসবাস করার সময়, আমার আগের বই *The Wolves of Islam: Russia and the Faces of Chechen Terror* ২০০৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার কিছু আগে। এটি ছিল এক কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ।

রুশ ভাষায় চেচনিয়া সংক্রান্ত সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে, বিশেষ করে আপনি যদি মস্কোতে থাকেন তবে যেকোনো রুশ পত্রিকা খুললেই তা দেখতে পাবেন। তাছাড়া টেলিভিশনে প্রতিদিন ভিডিও ফুটেজ এবং প্রতিবেদন থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, আদালত, সংবাদমাধ্যম এবং বিদ্রোহীদেরদের ওয়েবসাইটগুলোতেও এসব তথ্য পাওয়া যায়। আমার নিজের ওয়েবসাইট *Russia-Eurasia Terror Watch* (রুশ ভাষা থেকে অনূদিত) এও তাই। কিন্তু সাধারণ চেচেন নারীদের সম্পর্কে এবং যুদ্ধে তাদের ভূমিকা নিয়ে তুলনামূলকভাবে খুব কমই জানা যায়।

আমাকে চেচনিয়াতে যেতে হতো, কিন্তু কোনো বিমানে চেপে গ্রোজনি (Grozny) শহরে নেমে পথে পথে নারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়াটা খুব সহজ কিছু ছিল না। বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন চেচেন জিহাদিস্ট ওয়েবসাইট www.Kavkazcenter.com ২০০৫ সালের একটি সাক্ষাৎকারে আমার বলা কিছু কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে ‘CIA-এর একজন স্পেশাল এজেন্ট’ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বলে আমি ‘ভয়ঙ্কর পুতিন রেজিমের’ হয়ে কাজ করছি। সরকারি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং *Forbes* পত্রিকার সাংবাদিক পল ক্লেবনিকভের (Paul Klebnikov) ঘটনার পরেও আমি গোপনে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। ২০০৭ সালে একটা ছোট সুযোগ এসেছিল তবে শেষ পর্যন্ত ২০০৯ সালের বসন্ত পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয় চেচনিয়াকে দশ বছরের জন্য ‘কাউন্টার টেরর অপারেশন’ (KTO - Counterterror Operations) অঞ্চল হিসেবে দেওয়া ঘোষণাটি প্রত্যাহার করা অব্দি। ততদিনে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রায় সম্পূর্ণই হয়ে গিয়েছিল।

মস্কোভিত্তিক সম্মানিত মানবাধিকার সংস্থা ‘মেমোরিয়াল’ আমার লিখিত তথ্যের একক শ্রেষ্ঠ উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তবে মেমোরিয়াল চেচনিয়ার মাত্র ৩০ শতাংশ এলাকার খবর সংগ্রহ করে থাকে। পাঠকের জন্য উচিত— চেচনিয়া প্রায় ছয় হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এটি বৃহত্তর ককেশাস পর্বতমালার উত্তর ঢাল থেকে নিয়ে দক্ষিণ রাশিয়ার তেরেক-কুমা নিম্নভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অবস্থিত। যুদ্ধকালে চেচেন শরণার্থীদের নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসব সাক্ষাৎকার নিয়েছে, সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। এছাড়া, এনজিও ‘ইউনিয়ন উইমেন অব দ্য ডন’ চেচেন নারীদের নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছে, যা আমি বইটিতে উদ্ধৃত করেছি।

নারী আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের নিয়ে ইউলিয়া ইউজিক (Yulia Yuzik) রচিত ২০০৩ সালের বই *Nevestiy Allakha* ছাড়া চেচেন নারীদের নিয়ে আর কোনো বই নেই। আমি ইউজিকের বই এবং চেচেন যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের ওপর রচিত অন্যান্য বইগুলো থেকে যেগুলো প্রয়োজন, সেগুলোর উল্লেখ করেছি। আমি যেসব ইংরেজি বই থেকে তথ্য নিয়েছি, তার মধ্যে আছে:

- ড. খাসান বাইয়েভের (Khassan Baiev) *The Oath* (২০০৩),
- আসনে সেয়ারস্টাডের (Asne Seierstad) *The Angel of Grozny: Orphans of a Forgotten War* (২০০৮),
- আন্না পলিটকোভস্কায়া (Anna Politkovskaya) *A Russian Diary* (২০০৭) ও *A Small Corner of Hell: Dispatches from Chechnya* (২০০৩),
- এবং আন নিভার (Anne Nivat) রচিত *Chienne de Guerre: A Woman Reporter behind the Lines of the War in Chechnya* (২০০১)।

এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনের গল্পগুলো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Allah’s Angels বইটি আমার আগের বইটির মতোই, যদি আমি রাশিয়ায় দশ বছর না থাকতাম তবে কখনোই বইটা লেখা সম্ভব হতো না। সেই সময় আমি অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি, আলোচনা করেছি, বিতর্ক করেছি। পাশাপাশি আমি রুশ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ ‘স্টেট দুমা’র সঙ্গে একটি ‘সন্ত্রাসবিরোধী’ সহযোগিতা প্রকল্পে কাজ করেছি, যা এই বিষয়ে গবেষণা ও বোঝাপড়ায় অনেক সহায়ক হয়েছে। আমি যাদের সঙ্গে কথা

বলেছি, তাদের প্রত্যেকেরই বলার মতো কিছু ছিল। বেশিরভাগই উদারভাবে তথ্য শেয়ার করেছেন। কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত গল্প বলেছিলেন, কেউ কেউ সরাসরি ঘটনাস্থল ও অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আবার কেউ কেউ দিকনির্দেশনা, পরামর্শ, বইয়ের অংশ পড়ে সংশোধনী ও মতামত দিয়েছেন। তাদের সকলকে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার চেচেন ছাত্রছাত্রীরা, প্রফেসর ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাশিয়ান পুলিশ ও সেনা সদস্য, সাংবাদিক, রুশ রাজনীতিবিদ, রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের এক পুরনো বন্ধু, চেচেন মানবাধিকার কর্মী, এবং রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে বসবাসরত চেচেন বন্ধু ও পরিচিতজনরা—যাদের আমি এই কয়েক বছরে চিনিছি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এলজা পি. এর প্রতি, যিনি একজন চেচেন রুশ ভাষা শিক্ষক; এবং সাঈদ এস. এর প্রতি, যিনি চেচেনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি জাওহার দুদায়েভ-এর সাবেক দোভাষী। তারা কয়েক বছর ধৈর্য ধরে আমার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং আমাকে চেচেন সংস্কৃতির জটিলতা বুঝতে সহায়তা করেছেন। যদি কোথাও কোনো ভুল থেকে থাকে তবে তার দায় শুধুই আমার। হয়তো আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনি নি কিংবা কোনো সূক্ষ্ম অর্থ হারিয়ে ফেলেছি।

আমি কৃতজ্ঞ গিস্তাম সাকায়েভা-এর প্রতিও, যিনি একজন প্রাক্তন চেচেন যুদ্ধ শরণার্থী এবং বর্তমানে গ্রোজনিভিত্তিক এনজিও ‘রিলায়েন্স’ (Reliance) এর বোর্ড সদস্য। এই সংস্থা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকারদের সহায়তা করে এবং একক বা বিধবা নারীদের স্বনির্ভর জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তিনি চেচেন নারীদের অধিকার এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সিনেটর আলেকজান্ডার তোরশিনকে, যিনি রাশিয়ার সংসদের উচ্চকক্ষ ‘ফেডারেশন কাউন্সিল’-এর ডেপুটি স্পিকার এবং উত্তর ককেশাস বিষয়ে একজন শীর্ষ বিশেষজ্ঞ। ২০০৯ সালের বসন্তে তিনি আমার সঙ্গে তার মূল্যবান গল্পগুলো শেয়ার করেছিলেন। আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলাপ করেছি উসাম বেসায়েভ-এর সাথে, যিনি রেডিও ফ্রি ইউরোপ এবং রেডিও লিবার্টির একজন সাংবাদিক; এবং মিলানা বাকায়েভা-এর সঙ্গে, যার সাথে আমার দেখা হয় ২০০৭ সালের জুনে ওয়াশিংটন ডিসিতে। সে সময় তিনি তার অসাধারণ বই *Danser sur les ruines. Une jeunesse tchétchène* প্রচারের জন্য এসেছিলেন। বর্তমানে তিনি ‘মেমোরিয়াল’ মানবাধিকার কেন্দ্রে কাজ করছেন। আমি

বইটিতে তাকে তার লেখক-নাম ‘তেরলোয়েভা’ নামে উল্লেখ করেছি।

ধন্যবাদ জানাতে চাই www.KavkazWeb.net ওয়েবসাইটকেও, যারা ২০০৭ সালে উত্তর ককেশাসের মানুষদের সঙ্গে দুই ঘণ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘লাইভ চ্যাট’ সেশন আয়োজন করেছিল। এছাড়াও, www.retwa.com এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর নাম না-জানা অনেক মানুষের কাছ থেকেও আমি নতুন অনেক কিছু শিখেছি।

আমার দুঃখ রয়ে গেছে যে, আমি চেচেন রাষ্ট্রপতি আসলান মাসখাদভের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলিয়াস আখমাদভ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি, যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। তখন তাকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন ছিল এবং তার মার্কিন সহকারীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সাক্ষাৎ করতে রাজি হননি।

এই বইটি ছিল এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কঠিন প্রকল্প। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম নারীদের পাশাপাশি শিশুদের নিয়েও লিখব, কিন্তু দ্রুত বুঝে গিয়েছিলাম যে, একটি বইতে তা সম্ভব নয়। আমি আশা করেছিলাম *Wolves of Islam* বইটির পরে দুই বছরের মধ্যেই পাভুলিপি শেষ করে ফেলব। কিন্তু সময় লেগেছে পাঁচ বছর। তবে আমি মনে করি, সেই সময়টুকু বইটিকে আরও পরিপক্ব করেছে। কারণ এর ফলে আমি ঘটনাগুলো নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে এবং নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছি। তদুপরি, সময় প্রমাণ করেছে এই বইয়ের কেন্দ্রীয় থিমটি সত্য: মৃত্যু চিরকাল চেচেন নারীদের পিছু ছুঁটেছে, এবং আজ চেচেনিয়ায় যতই পুনর্গঠন হোক না কেন, শান্তি ও নিরাপত্তা আজও তাদের কাছে অধরা।

এই বইটি লেখাও আমার জন্য এক আবেগঘন অভিজ্ঞতা ছিল। একদিকে চেচেন জনগণের সীমাহীন যন্ত্রণায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত, অন্যদিকে আত্মঘাতী হামলায় নিরীহ রুশ বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুও আমাকে পীড়িত করছিল। রুশ সেনাদের দ্বারা নিরীহ চেচেনদের লুটপাট, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড যেমন আমার মনে ঘৃণার উদ্বেক করে, ঠিক তেমনি রুশ সেনাদের কাটা মাথা বর্শায় গোঁথে প্রদর্শন করা, অথবা কাস্তে-কামানের আঘাতে তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহগুলোর ছবিও আমার মনে আতঙ্ক জন্ম দেয়।

আপনি যাকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন, সাম্প্রতিক রুশ-চেচেন যুদ্ধ নিয়ে আবেগ সব পক্ষেই তীব্র। আমি বিশ্বাস করি, এখানে আমি একটি ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করেছি। তবে আমি জানি, কেউ কেউ এতে অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ কিংবা আহত হতে পারেন। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই বইয়ে যে

সিদ্ধান্তগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ আমার নিজের, এবং যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই মতামতগুলোকে জড়ানো যাবে না, যতক্ষণ না আমি তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছি।

আমার সমালোচকদের জন্য আমি স্বীকার করছি, *Allah's Angels: Chechen Women in War* একটি অপরিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বই, কারণ সবকিছু এক বইয়ে বলা সম্ভব নয়। কিছু বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া যায়নি, আবার কিছু ব্যক্তি ও প্রসঙ্গ বাদ পড়ে গেছে। তদুপরি এই গল্পটি একটি চলমান অধ্যায়, নতুন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

সবশেষে, আমি মনে করি ইতিহাসবিদ বার্ট্রাম ডি. উলফ তার *Three Who Made a Revolution* বইয়ে যথার্থই লিখেছিলেন— ‘যেই মুহূর্তে আপনি একটি বই লিখে শেষ করেন, তা অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে থাকে। শেষ অধ্যায়টা লেখার পর মনে হয় আগের অধ্যায়ে আরেকটু পরিবর্তন দরকার। বইটি যখন ছাপার অপেক্ষায় থাকে, তখন লেখক নতুন করে প্রুফে পরিবর্তন করতে শুরু করেন। আর যখন প্রথম বাঁধাই করা কপিটি হাতে নেন, তখন মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়—ভুল বানান চোখে পড়ে, এবং যেসব বিষয়ে গতকাল পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলেন, তা নিয়েও নতুন করে মনের ভেতর প্রশ্ন জাগে।’



সময় তার অপ্রতিরোধ্য স্রোতের টানে সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আর শেষমেশ ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির গভীর অতলে। কিন্তু ইতিহাস সময়ের সেই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। যা কিছু ঘটে গেছে, তার মধ্য থেকে ইতিহাস যতটুকু শুষে নিতে পারে, তা সে ধরে রাখে এবং একসঙ্গে গেঁথে রাখে—সময়ের গহ্বরে হারিয়ে যেতে দেয় না।

— আন্না কোল্লেনা, দ্য অ্যালেক্সিয়াড



সূচনা

নাতাশার গল্প

‘অনেক বছর পর এবারই প্রথম আমার মনে হচ্ছে, আবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। সবকিছু যেন একটু একটু করে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। জীবন ফিরে আসছে তার পুরোনো ছন্দে। বলতে ভয় লাগে কিন্তু মনে হচ্ছে—আমি সত্যিই এই যুদ্ধগুলোর মধ্য দিয়ে বেঁচে ফিরেছি’—বসন্তের শুরুতে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে এমন আশাবাদের কথা বলেছিলেন নাতাশা।

কিন্তু তিনি ফিরতে পারেননি। ২০০৯ সালের মাঝ জুলাইয়ের এক তপ্ত দুপুরে ব্যস্ত সড়কের ধারে ঘাসে ঢাকা এক গভীর খালে পাওয়া গেল তার নিখর দেহ। হাতকড়া পরা, মাথার পেছনে দুটি ছোট, নিখুঁত বুলেটের ছিদ্র এবং বুকে আরও তিনটি গুলির চিহ্ন।

পঞ্চাশ বছর বয়সী এই নারী সেদিন সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। যিনি বরাবরই সময়নিষ্ঠ, তিনি সেইদিন সকাল দশটার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত হননি। সারাদিন তার সহকর্মীরা তার মোবাইলে বারবার ফোন করেছেন উদ্বিগ্নভাবে আর তার পনেরো বছর বয়সী মেয়ে লানা স্কুল শেষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় ছিল, মা কখন এসে তাকে নিয়ে যাবে।

প্রতিবেশীরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং শুনছিল—সেই চারজন মুখোশধারী লোক বাড়ির এক ব্লক দূরের রাস্তা থেকে তাকে তুলে নেয়। তারা তার চিংকার শুনছিল, তার মুখে ঘৃষি মারার ফলে যখন তার মুখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে সেটাও তারা দেখছিল। এমনকি যখন তাকে ধরে টেনে সাদা ঝিগুলি (Zhiguli—রাশিয়ার তৈরি একটি গাড়ির নাম) গাড়ির পেছনে ফেলে অপহরণকারীরা দ্রুত ছুটে যায়, তখনো তারা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জানতো, কেন তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে।

নাতাশা ছিলেন ‘ছোট স্তালিন’ নামে পরিচিত তাদের অঞ্চলের শাসক রমজান কাদিরভের একজন তীব্র সমালোচক। তিনি গোপনে এই নামেই ডাকতেন তাকে। ইসলামী জিহাদীদের সাহায্য করার অপরাধে রিজভান নামের এক ব্যক্তিকে শুধু

অন্তর্ভাস পরা অবস্থায় জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সেই ঘটনাটি তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন, যা ছোট স্তালিনকে খুবই ক্ষিপ্ত করে তোলে। নাতাশার মাথায় ওড়না না পরার প্রতিবাদটিও ছিল তার অসন্তোষের আরেক কারণ। নাতাশা যেসব বিষয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান চালাতেন তা হলো—মানুষ অপহরণ, গুম, মাঝরাতে বাড়িঘরে আগুন দেওয়া ইত্যাদি। এবং এ নিয়ে শাসকদের অভিযোগ ছিল, তিনি নাকি এসব করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, এমনকি উগ্রপন্থীদেরও সাহায্য করছেন।

বন্ধুরা তাকে সতর্ক করেছিল, খুব শক্তিশালী কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। এমনকি তিনি একবার ইংল্যান্ডেও পালিয়ে গিয়েছিলেন এই হুমকির কারণে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফাতিমা ক্লিসোভা বলেন, ‘লোকেরা তাকে সাবধান করেছিল, আমিও করেছিলাম। বলেছিলাম, যদি সে ফিরে আসে, একদিন তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু কেন? কেন সে এসব করেছিল? কারণ সে ছিল একজন চেচেন। আর এই মানুষগুলো ছিল তার নিজেরা।’

নাতাশার এই গল্প কোনো থ্রিলার উপন্যাস নয়। তার আসল নাম নাতালিয়া এস্তিমিরোভা, বন্ধুরা তাকে আদর করে নাতাশা বলত। তিনি ছিলেন রক্ত মাংসের এক জীবন্ত মানুষ, তার ছিলো একটি হৃদয় ও একটি আত্মা। এমন নির্মম মৃত্যু কোনোভাবেই তার প্রাপ্য ছিল না।

প্রাক্তন ইতিহাস শিক্ষক এই নারী ২০০০ সাল থেকে মস্কোভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন মেমোরিয়াল-এর একজন অক্লান্ত মানবাধিকারকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। চেচেনিয়ায় প্রেসিডেন্ট রমজান কাদিরভ (যাকে তিনি ‘ছোট স্তালিন’ বলতেন)—এর শাসনে ঘটে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের গভীর অনুসন্ধান চালানোর কারণেই তাকে হত্যা করা হয়।

‘তিনি সত্য কথা বলতেন। আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কখনো কখনো কঠোরভাবে হলেও খোলামেলা মূল্যায়ন করতেন।’—রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ তার দেশের জনগণকে এমনটাই বলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তাকে স্মরণ করা হয়েছিল এভাবে— ‘মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আলোকপাত করতে নিবেদিতপ্রাণ’, ‘সত্যের অনুসন্ধান আপসহীন,’ এবং ‘সেইসব মানুষের হয়ে কথা বলতেন, যাদের কষ্ট উপেক্ষিত হতো।’

২০০৪ সালে তিনি সুইডিশ পার্লামেন্টের ‘Right to Existence’ পুরস্কার লাভ করেন, যা তার সাহস ও মানব মর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি। এরপর

২০০৫ সালে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের রবার্ট শুমান মেডেল এবং ২০০৭ সালে আন্না পলিটকোভস্কায়া RAW-in-War পুরস্কারে ভূষিত হন।

ভ্লিসোভা আক্ষেপ করে বলেন, ‘গতরাতে আমি ভাবছিলাম, তিনি সঙ্গে করে কত তথ্য নিয়ে চলে গেলেন, কত মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে গেল তার অনুপস্থিতিতে, কতজন হয়ে গেল এতিমের মতো একা।’ আমি মনে করি না কেউ তার বিকল্প হতে পারবে। এটা চেকনিয়ার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। নাতাশা সত্যিই অনেকের হৃদয়ে রয়ে যাবেন।

অন দ্য ফ্রন্টলাইন

জীবিত অবস্থায় নাতাশা ছিলেন সত্যের এক উজ্জ্বল প্রদীপ এবং মৃত্যুর পরও তিনি একটি চূড়ান্ত লজ্জাজনক সত্য উন্মোচন করে গেলেন যে, চেকেন নারীর পিছু পিছু সর্বক্ষণ মৃত্যু হেঁটে চলে, রমজান কাদিরভের চেকনিয়ায় নারীর জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা এখনও অধরা। নাতাশার ট্র্যাজেডি কেবল তার একার নয়, এটি প্রতিটি চেকেন নারীর গল্প, যারা গত দেড় দশক ধরে সহ্য করে চলেছেন এমন সব যন্ত্রণা ও কষ্ট, যার গভীরতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এই অসহনীয় দুর্ভোগের পেছনে রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে দুটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, আর জিহাদিদের সঙ্গে রাশিয়ার চলমান লড়াই, যারা চায় চেকনিয়া ও উত্তর ককেশাসে তালেবানের মতো একটি নতুন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

১৯৯১ সালে প্রাক্তন সোভিয়েত বিমানবাহিনীর জেনারেল এবং বিদ্রোহী চেকেন প্রেসিডেন্ট জাওহার দুদায়েভ একতরফাভাবে চেকনিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেন। সেই থেকে চেকেন সেনাবাহিনী, শক্তিশালী ওয়ার্ডল্ডেরা—যাদের ব্যক্তিগত ভাড়াটে সৈন্য ছিল, বিদেশি ইসলামি যোদ্ধারা, স্বাধীনতাকামীরা, গুল্ডা-মাস্তানরা এমনকি সাধারণ চেকেনরাও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে।

প্রথম রুশ-চেকেন যুদ্ধে (১৯৯৪-১৯৯৬) চেকনিয়া জয়লাভ করে। এরপর দ্বিতীয় রুশ-চেকেন যুদ্ধ শুরু হয়, যখন চেকেন যুদ্ধনেতা শামিল বাসায়েভ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দাগেস্তানে প্রবেশ করেন একটি নতুন ইসলামি রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক খাঁটি ইসলামি ভূমি তৈরি করতে, যেটা রুশ কাফেরদের থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। এই আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা ও ১৯৯৯ সালে মস্কোর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ভয়াবহ বোমা হামলাগুলো

মিলে দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের সূচনা করে।^(১) রাশিয়ান সেনাবাহিনী এরপর খুব দ্রুত চেচনিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে, যা তারা পাঁচ বছর আগেই শুরু করেছিল। দেশটিকে একেবারে জনশূন্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়।

চেচনিয়ার চেহারা এখন অনেক বদলে গেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে এক ঝকঝকে নতুন ইউরোপীয় শহর গ্রোজনি, যেটি একসময় এতটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল যে রাস্তায় কুকুরেরা পঁচে যাওয়া লাশ কুঁড়োত। এখন সেই শহরের পার্কে মায়েরা বাচ্চাদের স্ট্রোলারে (চাকার ঝাঁপি/বেবি গাড়ি) করে ঘুরছেন, চারপাশে ঝরনা দিয়ে সাজানো। স্কুলগুলোতে আবার বাচ্চাদের পদচারণা তৈরি হচ্ছে। এমনকি এখানে একটি বিশ্বমানের নতুন মসজিদও তৈরি হয়েছে, যা ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। যেখানে একসঙ্গে দশ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে পারেন।

চেচনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গুদারমেস এখন সত্যিই এক অপূর্ব সুন্দর শহর। মোলোতলা আবাসিক ভবন, ডিজনিয়াল্যান্ড-ধাঁচের অ্যাকোয়াপার্ক—যেখানে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা সুইমিংপুল রয়েছে। আছে রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে। সব মিলিয়ে এখানে এখন আর কিছুই নেই যা দেখে বোঝা যাবে, এখানে কখনো যুদ্ধ হয়েছিল। নির্মাণকাজ চলছে সর্বত্র, কিন্তু এই আধুনিক, ঝাঁ-চকচকে দৃশ্যপটের আড়ালে আজও চলছে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস ও প্রতিসন্ত্রাস যুদ্ধ। একসময় আমি চেচনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হয়েছিলাম। ইসলামিস্ট বিদ্রোহী নেতা শামিল বাসায়েভ ২০০৬ সালের জুলাইয়ে নিজের বিস্ফোরকবোম্বাই ট্রাকে মারা যান। পরের বছর অপহরণ কমে আসে, রাশিয়ান বাহিনী ও চেচেন সরকারের ওপর হামলার সংখ্যাও কমে যায়। ২০০৯ সালের বসন্তে ওয়াশিংটনে যখন আমি রাশিয়ার ফেডারেশন কাউন্সিলের উপ-স্পিকার, সিনেটর আলেক্সান্ডার টরশিনের সঙ্গে কথা বলি, তখন তিনি খুবই আশাবাদী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চেচনিয়ায় দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ চলছে, পাহাড়ে তখন আর একশ’র বেশি যোদ্ধাও নেই এবং দীর্ঘ দশ বছরের পুরনো কে.টি.ও (Counterterror Operations) তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানও শেষ হয়ে গেছে। আমাকে বলা হয়েছিল, আমি চাইলে এখন চেচনিয়ায় বেড়াতে যেতে পারি। কিন্তু তার এক মাসের মধ্যেই আত্মঘাতী বিদ্রোহীরা আবার গ্রোজনির কেন্দ্রস্থলে হামলা চালাতে শুরু করে। বছর শেষ হওয়ার আগেই বারোটটি আত্মঘাতী হামলা হয়। কেউ আর পার্কের ডাস্টবিনের পাশেও দাঁড়াতে সাহস করত না। কারণ, সেখানে হয়তো বোমা লুকিয়ে রাখা আছে।

২০০৯ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ অপহরণের ঘটনা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে,

২০০৮ সালের চেয়ে দ্বিগুণ। নাতাশা ও রিজভানের মতো হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়। রমজান কাদিরভ ঘোষণা করেন, কারো কোনো জিহাদপন্থী আত্মীয় থাকলে তার জন্য পুরো পরিবারকেই দায় নিতে হবে; আরও বেশি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং কাদিরভ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যার মধ্যেই সামান্য ওয়াহাবিবাদের গন্ধ পাওয়া যাবে, তাকেই তিনি হত্যা করবেন। সহিংসতা আবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

নারীরা ১৯৯৪ সাল থেকে এই যুদ্ধের সম্মুখভাগে রয়েছেন। প্রতিটি নারীই নিজের মতো করে যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তারা সবাই এই রক্তাক্ত যুদ্ধগুলোর প্রকৃত ভুক্তভোগী। দিনের পর দিন সহিংসতা, সন্তান হারানো মায়ের কান্না, আর পরিবার বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম চিরাচরিত চেচেন নারীর জীবনধারা বদলে দিয়েছে। তারা এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সমাজে নারীর ঐতিহ্যগত ভূমিকা পেছনে ফেলে যুদ্ধ তাদেরকে গড়েছে আরও দৃঢ়, সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল এক মানুষ হিসেবে।

কিন্তু আজ তার যুদ্ধকালীন অবদান আর কেউ গুরুত্ব দিয়ে দেখে না। পুরুষেরা নারীর নতুন ভূমিকা মেনে নিতে পারছে না, যে অধিকারগুলো সে কঠিনভাবে অর্জন করেছিল, সেগুলো আবার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে প্রথাগত ইসলামের নামে। নারীদের ওপর সহিংসতা এখন চলমান, কখনো কখনো তা উৎসাহিতও করা হচ্ছে এবং এই সহিংসতা ক্রমেই বাড়ছে। চেচেন নারী আবার গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন, বোমায় উড়ে যাচ্ছেন, অপহৃত হচ্ছেন, সড়ক থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিঞ্জাসাবাদের জন্য। কারণ, হয়তো তার কোনো আত্মীয় জঙ্গি সন্দেহে অভিযুক্ত^(২) সন্দেহ হলেই তার ঘরে আগুন দেওয়া হচ্ছে। তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোনো অচেনা পুরুষের সঙ্গে। অনৈতিক আচরণ করলে, কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সত্য প্রকাশ করলেও তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাকে বলা হচ্ছে, সে তার স্বামীর সম্পত্তি, আর তার জায়গা রান্নাঘরে।

চেচেন নারীর অবিস্মরণীয় যাত্রা

এই পৃষ্ঠাগুলো চিত্রায়িত করে চেচেন নারীর অবিস্মরণীয় জীবন-যাত্রার গল্প। ১৯৯৪ সালের গ্রোজনির নরকের গহ্বর থেকে শুরু করে আজকের দিনের চরম অস্থিরতার মধ্যে তার যাত্রাপথ।

সে সময় বোমা আর গুলির হাত থেকে বাঁচতে তাকে ছুটে পালাতে হতো, ধর্ষকদের হাত থেকে নিজের মেয়েদের লুকিয়ে রাখতে হতো, খাবারের জন্য পথে পথে খুঁজে ফিরতে হতো। এরপর বহু বছর ধরে তাকে পেরোতে হয়েছে হত্যাকাণ্ডের